বিদ্যুৎ অপচয় মানেই রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত ক্ষতি

মোঃ আতিকুর রহমান মুফতি

গুলশান এভিনিউ-এ অবস্থিত বৃহৎ একটি ডেভেলপার কোম্পানির কর্পোরেট অফিসের বড়োকর্তা মুনিফ মোর্শেদ। মধ্য-জানুয়ারির আরামদায়ক শীতের সকালে তিনি অফিসে ঢুকেছেন মাত্র। আসার আগে থেকেই তাঁর কক্ষটিতে চলছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, জ্বলছে বৈদ্যুতিক বাতি। কাঁচঘেরা ভবনটির নকশায় বাইরের বাতাস অবাধে ঢোকার তেমন কোনো ব্যবস্থাই রাখা হয়নি, ফলে বছরজুড়ে কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ওপরই ভরসা রাখতে হয়। আবার বাইরের দেয়ালগুলো কাঁচের হওয়ার পরও অফিস-সজ্জার অজুহাতে সেখানে ঝোলানো আছে পুরু ও ভারি কাপড়ের পর্দা। তাই বিদ্যুতের বাতিগুলোও জ্বলতে থাকে সারাক্ষণ। এছাড়া ২৪ ঘন্টার জন্য ভবনে লিফট, প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, সিসি ক্যামেরা, অনলাইনভিত্তিক অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাসহ সবই বিদ্যুৎ-নির্ভর। এতকিছু চালু রাখতে প্রতি মাসে ভবনটির জন্য প্রায় ২৫ লাখ টাকা বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে হয়। আর্থিক সঙ্গতি থাকলেই যে কেবল ঠান্ডা আবহাওয়াতেও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে অথবা দিনের বেলাতেও বাতি জ্বালাতে হবে-বিদ্যুৎ অপচয়ের এমন বিষয়টি অসংগতিপূর্ণ মনে হয় মুনিফ মোর্শেদের কাছে। তবুও বছরের পর বছর এভাবেই চলছে।

আবার, বছরের ঠিক এই সময়টিতেই যশোরের মণিরামপুর উপজেলার প্রান্তিক কৃষকরা ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে বোরো ধানের ক্ষেতে একটানা সেচ দিতে হিমশিম খাচ্ছেন। গত ২২ জানুয়ারি ২০২৬ গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, যশোর-১ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার প্রকৌশলী হরেন্দ্রনাথ বর্মন জানিয়েছেন, চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় এবং জাতীয় গ্রিডের সঞ্চালন লাইনে সমস্যার কারণে কিছু এলাকায় লোডশেডিং করতে হচ্ছে। যশোর-১ পল্লী বিদ্যুৎ এলাকার চাহিদা ১২০ মেগাওয়াটের বিপরীতে সরবরাহ রয়েছে ১০০ মেগাওয়াট। তাই রেশনিং পদ্ধতি বা লোডশেডিং এর মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে, সরকারের পাওয়ার গ্রিড কোম্পানির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসের ২৯ তারিখ দুপুর একটায় দেশে বিদ্যুতের চাহিদা ছিলো ১১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট, যার বিপরীতে উৎপাদন ছিলো ১০ হাজার ৬৩ মেগাওয়াট। ফলে সেসময় লোড ম্যানেজমেন্ট বা লোডশেডিং করতে হয় এক হাজার ৮৬ মেগাওয়াটের।

আসন্ন সেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকার সব রকম পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেছে। কারণ, বোরো আবাদের সময় সাধারণত বিদ্যুতের ব্যবহার অতিরিক্ত পাঁচ হাজার মেগাওয়াট পর্যন্ত বেড়ে যায়। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) এক কর্মকর্তা গণমাধ্যম কে বলেন, বর্তমানে দেশে প্রতিদিন সর্বোচ্চ ১১ হাজার ৬০৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। তবে সেচ মৌসুমে অর্থাৎ আগামী মার্চ-এপ্রিল মাসেই বিদ্যুতের চাহিদা ১৭ হাজার মেগাওয়াটে পৌঁছাতে পারে। আবার, আসন্ন গ্রীষ্মকালের বিষয়টি বিবেচনায় নিলে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা হতে পারে ১৮ হাজার মেগাওয়াট, যেখানে সর্বোচ্চ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ১৭ হাজার মেগাওয়াট। গতবছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের গ্রীষ্ম মৌসুমে দেশে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল ১৭ হাজার ৮০০ মেগাওয়াট। আর সর্বোচ্চ উৎপাদন ছিল ১৬ হাজার ৪৭৭ মেগাওয়াট। এ সকল পরিস্থিতি বিবেচনায় নিলে এটা সহজেই অনুমেয় যে, দেশের বিদ্যুৎ ঘাটতি সহসাই কাটছে না। তাই বিদ্যুৎ ব্যবহারে আমাদের মিতব্যায়ী হওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

একই সাথে আমাদের এটিও মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানির বড়ো একটি অংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। তাই, দেশে ১৩৫ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র থাকলেও আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে সব কেন্দ্র একসাথে চালু রেখে উৎপাদন সক্ষমতার পুরোটা কাজে লাগানোর ক্ষমতা আমাদের নেই বললেই চলে। অন্যদিকে, বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো থেকে বিদ্যুৎ কিনতে না পারলেও সরকারের সাথে তাদের বিদ্যমান চুক্তির কারণে ক্যাপাসিটি চার্জ হিসেবে তাদের ভাড়ার অর্থ পরিশোধ করতেই হয়। গত এক বছরে শুধু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভাড়া বাবদ সরকারের ব্যয় বেড়েছে ১০ হাজার কোটি টাকা। পিডিবি সূত্র বলছে, ২০২২–২৩ অর্থবছরে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ছিল ২৪ হাজার ৯১১ মেগাওয়াট। ওই বছর কেন্দ্রভাড়া দিতে হয়েছে ২৫ হাজার কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উৎপাদন সক্ষমতা বেড়ে দাঁড়ায় ২৮ হাজার ৯৮ মেগাওয়াট, কেন্দ্রভাড়া ছিল ৩২ হাজার কোটি টাকা। ১০টি বিদ্যুৎকেন্দ্রের চুক্তি নবায়ন না করায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা কমে হয় ২৭ হাজার ৪১৪ মেগাওয়াট হয়। সেইবার কেন্দ্রভাড়া দিতে হয়েছে ৪২ হাজার কোটি টাকা। এভাবেই এক বছরের ব্যবধানে কেন্দ্রভাড়া বেড়েছে ১০ হাজার কোটি টাকা।

বিশ্ববাজারে জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি, টাকার বিপরীতে ডলারের দামের ঊর্ধ্বগতি ও অলস বিদ্যুৎ কেন্দ্র গুলোর ভাড়া পরিশোধ করতে গিয়ে বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ ক্রমাগত বাড়ছে। এর মধ্যেই এক বছরের ব্যবধানে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের উৎপাদনে খরচ বেড়েছে প্রায় আট শতাংশ। গত দেড় দশকে পাইকারি পর্যায়ে ১২ বার ও খুচরা পর্যায়ে ১৪ বার বিদ্যুতের দাম বেড়েছে। পিডিবির তথ্য অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ হয়েছে ১১ টাকা ৫৪ পয়সা। আর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে খরচ হয়েছে ১২ টাকা ৩৪ পয়সা। অর্থাৎ, প্রতি ইউনিটে খরচ বেড়েছে ৯০ পয়সা। ইউনিট প্রতি বিদ্যুৎ উৎপাদনে ১২ টাকার বেশি খরচ হলেও পিডিবি তা বিক্রি করে সাত টাকা চার পয়সায়। ফলে প্রতিবছর পিডিবি কে সরকারের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ আর্থিক ভর্তুকি নিতে হচ্ছে। এখাতে গত অর্থবছরে সরকারকে ভর্তুকি দিতে হয়েছে ৫৯ হাজার কোটি টাকা।

এতকিছু জেনেও আমারা সবাই যে সবসময় বিদ্যুতের অপচয় থেকে নিবৃত হই, তা কিন্তু নয়। অনেকেই বাড়িতে রাতে লাইট জ্বালিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন, ঘরবাড়ি বা অফিস থেকে বের হওয়ার সময় লাইট-ফ্যান-ওয়াইফাইয়ের সুইচ অন রেখেই চলে যান। কেবল শোভা বৃদ্ধির জন্য বাড়ির বাইরে লাইটের ব্যবহার করেন, কম প্রয়োজনে বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, কম্পিউটার, টেলিভিশন, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার, চার্জার ইত্যাদি যন্ত্রপাতির বিদ্যুৎ সংযোগ চালু করে রাখেন। ঘরে মানুষ না থাকলেও অনেক সময় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্র ও ফ্যান চালু থাকে । বড়ো ভবনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্রের অতিরিক্ত ও অসচেতন ব্যবহার, যেমন- অতিরিক্ত কম তাপমাত্রা সেট করা, ভবন পর্যাপ্ত এয়ারটাইট না থাকা এবং নিয়মিত সার্ভিসিং না করার বিষয়টি ঘটেই থাকে, যার কারণে বিদ্যুৎ অপচয় বহুগুণে বেড়ে যায়। বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত ওভেন, ফ্যান, কম্পিউটার ইত্যাদি বন্ধ রাখার চর্চা করা প্রয়োজন। ওয়াশিং মেশিন চালাতে অনেক বিদ্যুৎ প্রযোজন হওয়ায় এর ব্যবহার কমানো দরকার। আবার, ড্রায়ারে বা ফ্যান ছেড়ে কাপড় শুকানোর বদলে বারান্দা বা ছাদে মেলে দেওয়ার পুরানো অভ্যাস ফিরিয়ে আনা আবশ্যক। রেফ্রিজারেটরের কয়েল পরিষ্কার রাখা, পানি গরম করতে গিজার বা হিটারের ব্যবহার কমানো ও ঘর থেকে বের হওয়ার সময় লাইট-ফ্যানের সুইচ বন্ধ করে দেওয়া অভ্যাস শৈশব থেকে গড়ে তোলার চেষ্টা করা দরকার। ইলেকট্রিক ওভেন, রাইস কুকার, কারি কুকার ইত্যাদি একেবারেই বাধ্য না হলে ব্যবহার বন্ধ রাখতে হবে এবং সবখানে এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার করতে হবে। দিনের বেলায় লাইট না জ্বালিয়ে ঘরের জানালা-দরজা খুলে রাখার মতো স্বাস্থ্যকর চর্চায় অভ্যস্ত হতে হবে । বিভিন্ন উৎসব কিংবা অনুষ্ঠানে আলোকসজ্জা থেকে বিরত থাকতে হবে। বিদ্যুৎ সংযোগে ত্রুটি থাকলে বিদ্যুৎ খরচ বেশি হয়, তাই সংযোগগুলো নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে। শিল্প-কারখানা আধুনিক ও এনার্জি এফিশিয়েন্ট যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়াতে হবে। এমনভাবে বহু উপায়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা যেতে পারে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে এখনো আমরা জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর বেশি নির্ভরশীল। নবায়নযোগ্য শক্তি যেমন সূর্যালোক ব্যবহার করে সৌরবিদ্যুৎ, বায়ু শক্তি ব্যবহার করে উইন্ড মিলের মাধ্যমে স্বল্প খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়টি আমাদের দেশে বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা স্মার্ট সিস্টেম, যেমন- সেন্সর ব্যবহারের মাধ্যমে শুধু প্রয়োজনে জ্বলবে এবং আলোকস্বল্পতা ও পর্যাপ্ততার সঙ্গে পরিবর্তিত হবে-এমন আলোক ব্যবস্থার ব্যবহার বাড়াতে পারি। বৃহৎ ভবনগুলোকে আধুনিক গ্লাস ও অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহারের মাধ্যমে এনার্জি এফিশিয়েন্ট করা যায়। প্রযুক্তিনির্ভর গ্লাস ব্যবহারে সামগ্রিকভাবে ভবনের মোট জ্বালানির ব্যবহার ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে আনা সম্ভব।

বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে তো বটেই, উন্নত দেশগুলোতেও বিদ্যুৎ অপচয় হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লরেন্স লিভারমোর ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি ২০১৮ সালে প্রকাশিত তাদের একটি গবেষণায় জানিয়েছে, খোদ যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত বিদ্যুতের ৬৮ শতাংশ অপচয় হয়। যেখানে প্রযুক্তির এত উৎকর্ষ সেখানকার অবস্থাও যদি এমন হয় তাহলে অন্যত্র অপচয়ের পরিমাণ আরও বেশিও হওয়াটাই যেন স্বভাবিক। তবে আমরা অপচয়কে প্রশ্রয় দিতে পারি না, কারণ বিশ্বে বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় জ্বালানির মজুদ অসীম নয়। আবার, আমাদের দেশে বিদ্যুতের অপচয় আইনগতভাবে একটি অপরাধও বটে। বিদ্যুৎ আইন-২০১৮ এর ৩৪ ধারায় বিদ্যুৎ অপচয় করলে দণ্ডের বিধান রয়েছে।

বাংলাদেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ‘ইনস্টিটিউট ফর প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট’- এর একটি গবেষণা অনুযায়ী, দেশে আবাসিক ভবন ও অফিস-আদালতে বর্তমানে চালু থাকা ১৯ লাখ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্র বা এসি ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এক ঘন্টা চললে এক হাজার ৮২০ থেকে দুই হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ খরচ হয়। ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় চললে বিদ্যুৎ খরচের পরিমাণ দাঁড়ায় এক হাজার ১৫০ থেকে এক হাজার ২২০ মেগাওয়াট। অর্থাৎ চার ডিগ্রি ব্যবধানে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় ৬৭০ থেকে ৭৮০ মেগাওয়াট। যা দিয়ে প্রায় তিন লাখ ৩৫ হাজার থেকে চার লাখ গ্রামীণ পরিবার তাদের দৈনন্দিন বিদ্যুতের প্রয়োজন মেটাতে পারে।

বিষয়টি অনুধাবন করলে বোঝা যায়, আমরা কেউ যদি সন্ধ্যায় একটি বৈদ্যুতিক বাতি কম জ্বালাই, তাহলে হয়তো নিভৃত পল্লীর কোনো একটি ঘরে স্কুল-পড়ুয়া শিশুটি সাশ্রয় হওয়া সেই বিদ্যুৎটুকু ব্যবহার করে বাতি জ্বালিয়ে পড়াশোনার সুযোগ পাবে। তাই, জাতীয় সম্পদ বিদ্যুতের অপচয় রোধে সবাইকে সচেতন হওয়ার বিকল্প নেই। আসুন, আমরা বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হই। কারণ, বিদ্যুৎ অপচয় মানেই আমাদের রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত ক্ষতি।

#

লেখক-সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর।

পিআইডি ফিচার